ইসমাইল-হাজেরার পথ ধরে

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ইসমাইল-হাজেরার পথ ধরে

© বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল: শ্রাবণ ১৪২৬, জুলাই ২০১৯

প্রকাশক: বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

লেখক: প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ

বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা ১২৩০

ফোন: ০২-৫৮৯৫৭৫০৯, ০২-৫৮৯৫৪২৫৬, ০১৭৬৬ ০৭ ৩৩ ২১

ইমেইল: biitpublications@gmail.com

মূল্য: ৫০.০০ টাকা

ISBN: 978-984-8471-67-8

সূচিপত্র

ইসমাইল-হাজেরার পথ ধরে ৫

পূর্ব কথা ৫

হজের তাগিদ ৯

শুরু হল প্রস্তুতি ১০

পুণ্যভূমিতে পদার্পণ ১৩

প্রথম ওমরা ১৬

হজের আগে বায়তুল্লাহ শরিফে জুম্মার নামাজ ২৫

মিনার পথে ২৭

আরাফাতের পথে ২৯

জিয়ারতে মদিনা: ইয়ানবি সালামু আলাইকা ৪০

আল-বিদা ৪৪

মক্কা-মদিনা ও হেজাজের ইতিহাস প্রসঙ্গ ৪৭

আরেকবার আল্লাহর ঘরে ৫৩

ইসমাইল-হাজেরার পথ ধরে

পূর্ব কথা

পবিত্র মক্কা শহরের নামের সাথে আমার হৃদয়ের আবেগের সম্পর্ক আশৈশব। যে শহরে জন্মেছিলেন আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মদ সা.। যে শহর আবাদ করেছেন আল্লাহর অনুগত বান্দা হজরত ইবরাহিম আ., কুরআনে তাঁর দীর্ঘ পথ পরিক্রমার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহর প্রতি তাঁর স্ত্রী হাজেরা এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল এর অসাধারণ আনুগত্য এবং আল্লাহর আদেশ পালনে আন্তরিকতার ইতিহাস পবিত্র কুরআনে প্রশংসার সাথে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর প্রেরিত নবিদের মধ্যে ইবরাহিম আ. কে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে দুটি উপায়ে, প্রথমত, তাকে মুসলিম জাতির পিতা সম্বোধন করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে হানিফা বলা হয়েছিল যার অর্থ হচ্ছে একনিষ্ঠ ও ধৈর্যশীল। হজরত ইবরাহিম আ. ইরাক বা মেসপটিমিয়া বা ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অঞ্চলে এক মূর্তিপূজারী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহ্যগতভাবে তার পিতা মূর্তিপূজাকে কেন্দ্র করে মূর্তি নির্মাতা ছিলেন। হজরত ইবরাহিম আ. স্বপ্রণোদিতভাবে তাঁর বিভিন্ন মাধ্যমে স্রষ্টাকে খুঁজে বেড়ান। প্রথমত, তাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মূর্তির মাঝে শক্তির সন্ধান করে দেখেন মূর্তিগুলো আসলে শক্তিহীন। আকাশের সূর্যকে আলোকোজ্জ্বল এবং তাপ প্রদানকারী দেখে সেটিকে স্রষ্টা মনে করেন। দিনের শেষে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখে তার ওপর আস্থা হারান। অতঃপর আকাশের তারকারাজিকে স্রষ্টা ভাবেন, আবার চাঁদের আলোয় তারাগুলো ম্রিয়মান হয়ে যেতে দেখে তারাগুলোর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। অবশেষে, তিনি আল্লাহর ইলহাম পেয়ে বলেন, 'ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ হিয়া লিল্লাজি ফাতারসসামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন' ভাবার্থ 'আমি তো একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি যিনি পৃথিবী এবং জগৎসমূহের স্রষ্টা এবং আমি কস্মিনকালেও মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই' (সুরা আন'আম, ৬: ৭৯)।

তাঁর এই ইমান গ্রহণ তার মনোজগতে বিপ্লব এনে দেয়। সেই কিশোর বালক অনায়াসে তার পিতৃপুরুষ শাসকগোষ্ঠীর সামনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা

সাহসের সাথে বলতে সক্ষম হন। এর পরিণতিতে পরবর্তীতে তাকে অনেক অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়। তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার প্রচেষ্টা হয়। এমনি নির্মম বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তার স্ত্রী সারাকে নিয়ে সুদূর ইরাক থেকে নানা পথ ঘুরে মিসরে যান। এখানেও তিনি তৎকালীন মিসরের অধিপতির দ্বারা নানাভাবে অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হন। ষাটোর্ধ্ব বয়সেও তার কোনো সন্তানাদি না হওয়ায় তার প্রথম স্ত্রী সারার পরামর্শে তিনি সারার দীর্ঘদিনের সহকারী কৃতদাসী হাজেরাকে বিয়ে করেন। ষাটোর্ধ্ব বয়সে হাজেরার গর্ভে তার পুত্র সন্তানের জন্ম হয়, যার নাম রাখেন ইসমাইল। হয়তোবা অনায়াসে ইসমাইল, হাজেরা এবং সারাকে নিয়ে তিনি সেখানে সুখে থাকতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহর মহান পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন রকম। সেই বৃদ্ধ বয়সের অন্ধের যষ্ঠি পুত্র ইসমাইল ও তার মা হাজেরাকে রেখে আসতে হবে বিক্কা নামক জায়গায়, যার পথনির্দেশনা ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ দিলেন। আল্লাহর আদেশে তিনি নির্ধারিত স্থানে তাদের রেখে সেখান থেকে চলে আসবেন। এ কথাটি মক্কায় উপনীত হওয়ার আগ পর্যন্ত হাজেরাকে তিনি জানাননি এই জন্য যে, হয়তোবা হাজেরা যেতে আপত্তি করবে। সুদূর মিসর থেকে নানা পথ ঘুরে হজরত ইবরাহিম তার নবজাতক পুত্র ইসমাইল এবং তার মা বিবি হাজেরাকে নিয়ে উপনীত হলেন মক্কায়। আজকের সেই আলোকিত মক্কা নয়। চারিদিকে পাহাড় বেষ্টিত কাঁটা ঝোপ। এছাড়া আর অন্য কিছু নেই। কাঁটা ঝোপের আড়ালে হিংস্র শ্বাপদ থাকার সমূহ সম্ভাবনা। এ রকম জায়গায় উপনীত হয়ে তিনি হাজেরা এবং তার সন্তানকে হজরত আদম আ.-এর আদি ইবাদতসাহ সংলগ্ন সাফা-মারওয়া পাহাড়ের সানুদেশে রেখে দ্রুত স্থান ত্যাগের উদ্যোগ নিলেন। সামান্য পরিমাণ খেজুর এবং পানি তাদের জন্য রেখে যাচ্ছিলেন। ইবরাহিম আ.-এর এভাবে আকস্মিক প্রস্থান দেখে বিবি হাজেরা শংকিত হলেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে সাফা অথবা মারওয়া বা কোনো এক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তাকে ডাক দিলেন, বললেন 'ইবরাহিম তুমি যে আমাদের রেখে যাচ্ছ, এটি কি তোমার ইচ্ছায়' ইবরাহিম শুধু বললেন এটি আল্লাহর ইচ্ছায়। হাজেরা তখন বললেন, 'আমি নিশ্চিন্তে আল্লাহর আদেশ মেনে নেব, তুমি যেতে পার'। শুধু ইবরাহিমই যে হানিফা তাই নয়, তার স্ত্রীও আল্লাহর প্রতি কত আস্থাবান তা এই ঘটনায় বোঝা যায়। ইবরাহিম আ. আল্লাহর আদেশ পালন করে আল্লাহর কাছে কাতরভাবে হাত তুলে বললেন, "হে আল্লাহ তোমার আদেশ আমি যথাযথভাবে পালন করেছি। আমার একমাত্র সন্তান এবং তার মাকে এক বিরান ভূখণ্ডে রেখে আমি চলে যাচ্ছি! তোমার আদেশ তোমার বান্দা রেখেছে এবার বান্দার অনুরোধ তুমি রক্ষা করো। আমার এই বংশধারাকে তুমি হেফাজত করো। তাদের মধ্যে তোমার মনমতো শ্রেষ্ঠ বান্দা প্রেরণ কর।" যখন কোনো মানুষ আল্লাহর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এবং শুধু আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন, তখন আল্লাহ তাঁর

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। হজরত ইবরাহিম-এর এই উদাহরণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ এটা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন।

ইবরাহিম আ. চলে গেলেন। বিবি হাজেরা পুত্রকে দেখাশোনা করছেন। কিছুদিন পর তার সঞ্চিত পানি এবং খেজুর শেষ হয়ে গেল। মাতৃদুগ্ধের জন্য সন্তান কান্নাকাটি করছে অথচ মা খেতে না পেলে অন্ততপক্ষে শুধু পানিও খেতে না পারলে সন্তানকে কিভাবে দুধ খাওয়াবেন! পানির সন্ধানে বিবি হাজেরা সাফা থেকে মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ে উঠেন আবার মাঝে মাঝে সন্তান কেঁদে উঠলে তাকেও দেখে যান। এভাবে সাফা থেকে মারওয়া তিনি আকুল হয়ে ছোটাছুটি করছিলেন। সপ্তমবার কান্না শুনে ইসমাইলের কাছে এসে দেখলেন তার শিশু ইসমাইল কাঁদতে কাঁদতে যেখানে পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করছিলেন সেখানে একটি পানির ধারা বয়ে গেছে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আশপাশ থেকে পাথর সংগ্রহ করে পানির ধারাটিকে ধরে রাখার জন্য একটি জলাধার তৈরি করলেন। আর পানি দেখে তার মুখ দিয়ে অবাক বিস্ময়ে যে শব্দ বের হলো তা হলো 'জামজাম'। এটি ব্যাবিলনীয় ভাষা, যার অর্থ পানি। পানির সমস্যার সমাধান হলো। ইবরাহিমের রেখে যাওয়া খেজুর শেষ হচ্ছিল; হাজেরা সেই খেজুরের বিচিগুলো সুবিধাজনক জায়গায় বুনে দিচ্ছিলেন। এর মাঝে ওই দিক দিয়ে এক কাফেলা যাচ্ছিল। কাফেলার পানির সঙ্কট দেখা দিলে পানির সন্ধানে তারা সেখানে এলো। বিবি হাজেরা বলল, 'হ্যাঁ, তোমরা পানি নিতে পার, বিনিময়ে আমাকে খাবার দিতে হবে'। কাফেলার লোকজন দেখলেন পানি অত্যন্ত সুপেয়। তারা বিবি হাজেরার জমজমের পানির বিনিময়ে চাহিদার থেকেও বেশি খাবার এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে গেলেন। ফিরতি পথে তারা অন্যান্য কাফেলাকে বললেন যে, সবচাইতে ভালো পানির উৎসটি সেখানে পাওয়া যায়। কাজেই জমজমকে কেন্দ্র করে মক্কার আশপাশে ক্রমান্বয়ে একটি জনপদ তৈরি হলো যার নেতৃত্ব দেন হাজেরা এবং ইসমাইলের বংশধর। ইতিহাস এখানেই থেমে থাকেনি। বিবি হাজেরার আদরের ছেলেটি কৈশোর এবং যৌবনের মাঝামাঝি বয়সে উপনীত হলেন। মাঝে মাঝে ইবরাহিম আ. তাকে দেখতে আসেন। সেবারও আসলেন। তার প্রতি স্বপ্নাদেশ এলো, কুরবানি করার জন্য। তিনি আল্লাহর আদেশে একের পর এক কুরবানি করলেও বারবার একই আদেশ আসতে থাকল। সর্বশেষে আদেশ এলো, তোমার প্রিয়তম বস্তু কুরবানি কর। আল্লাহর আদেশের অর্থ হজরত ইবরাহিম আ. বুঝতে পারলেন। তিনি পুত্র ইসমাইলকে এই আদেশের কথা বললেন। পুত্র নির্দ্বিধায় বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর যদি আদেশ থাকে তবে আমি আল্লাহর পথে জবাই হতে রাজি'। সেইদিন থেকে ইসমাইলের নাম হয়ে গেল জাবিউল্লাহ। এখানে আরও অনেক ঘটনা; মায়ের সামনে তাঁর একমাত্র সন্তানকে কুরবানি! দেখতে খারাপ দেখা যায়। অতএব আল্লাহর আদেশ পালনের ব্রত নিয়ে মক্কা থেকে মিনার হালাকা নামক জায়গায় তাকে কুরবানির জন্য নিয়ে গেলেন। পথে জামারা নামক স্থানে

শয়তান হজরত ইসমাইলকে নানা রকম কুমন্ত্রণা দিচ্ছিল যে, তুমি কুরবানি হতে যাবে না। অতপর জামারা নামক জায়গায় ইসমাইল এবং তার পিতা ইবরাহিম শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করেন। তারপর সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি উপস্থিত হলো। সন্তান মাটিতে শুয়ে নিজেকে পেশ করলেন। সন্তান বললেন যে, পিতা আপনি আল্লাহর আদেশ পালন করুন! পিতা সন্তানের গলা চেপে ধরলেন, ছুরির ধার পরীক্ষা করলেন অতঃপর চোখ বুজে ছুরি চালালেন, রক্তের ধারার শব্দ শুনলেন। পিতার মন কেঁদে উঠল। তিনি তাকিয়ে দেখলেন পাশে তার সন্তান ইসমাইল। আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম এলো, 'ইবরাহিম, আল্লাহ তোমার কুরবানি কবুল করেছেন এবং তোমার প্রতি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পাক পূর্ণ করবেন'। সেই থেকে তওহিদবাদে বিশ্বাসী সকল মানুষের কাছে মক্কায় সফর এবং বিশেষভাবে ওই জিলহজ মাসে ইবরাহিম আ. এবং তার পুত্র ইসমাইল এর ত্যাগের সময়টিকে কেন্দ্র করে হজ অনুষ্ঠিত হতে থাকল। নানা সময় মানুষ পথভ্রষ্ট হলে আল্লাহ নবি-রসুল দিয়ে তাদের হেদায়াতের পথ দেখাতেন। পথভ্রষ্ট হয়ে যে পথেই যাক, কাবা মানুষের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান এবং হজের স্থান হিসেবে সব সময়ই পরিচিত হয়ে আসছে। হজের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সাফা এবং মারওয়ায় সায়ী করা। সেটা আল্লাহ বাধ্যতামূলক করেছেন। সন্তানের জন্য খাদ্যন্বেষণরত একজন নারীকে আল্লাহ এতটাই সম্মানিত করেছেন যে, আজ প্রায় চার-পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ আল্লাহর ইবাদত করতে গিয়ে সেই মহিলার পথেই সাতবার পায়চারী করছেন। সকল হাজী সাহেবান বিবি হাজেরার পদচিহ্নের অনুগামী।

ইতিহাস এখানেই থেমে থাকেনি। ইসমাইল আ.-এর বংশধারায় রহমাতাল্লিল আল-আমিন, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, নবিদের সর্দার এবং শেষ নবি হজরত মুহাম্মদ সা.-এর আগমনে এবং তাঁর মাধ্যমেই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রেরিত দীন পূর্ণতা পায় এবং মক্কা নগরী হজের কেন্দ্র হিসেবে স্থায়ীভাবে বহাল থাকল।

মক্কায় হজ প্রতিটি সক্ষম মুসলিম নর ও নারীর জন্য ফরজ। প্রতিটি মুসলমানের মক্কায় ভ্রমণের তীব্র আকুতি থাকে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুলের গানের মধ্যে আছে, 'বক্ষে আমার কাবার ছবি চক্ষে মুহাম্মদ রসুল সা.।' এ থেকেই বোঝা যায় প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে ঐ স্থানগুলোর প্রতি কি পরিমাণ আবেগ ও ভালোবাসা। ইসমাইল আ.-এর বংশধর মানব জাতির মুক্তিদূত হজরত মুহাম্মদ সা.-এর সম্মানে যে শহর গড়ে উঠেছে তার নাম মদিনাতুন্নবী বা মদিনা। যেখানে রসুল সা.-এর রওজা মোবারক অবস্থিত। রসুল সা.-এর রওজা মোবারক জিয়ারত যদিও হজের অংশ নয় তবুও রসুল সা.-এর রওজা জিয়ারত প্রতিটি মুসলিমের অতীব আকাঙ্খিত কাজ। মক্কা ও মদিনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মুসলিম উম্মাহর মিলনভূমি।

হজের তাগিদ

মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসেবে মক্কা মদিনার এই ঐতিহাসিক জায়গাগুলোতে যাবার তাড়না সেই শৈশব তথা ছোট বেলা থেকেই অনুভব করি। আমাদের কুমিল্লা শহরে দেখতাম যারাই হজে যাবেন; হজে যাবার অনেক আগে থেকেই সেই মফস্বল এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে সম্ভাব্য হজযাত্রীদের ডেকে ডেকে দাওয়াত দেয়া হতো। হজের পর হাজি সাহেব ফিরে আসার পর আবারও দাওয়াত পেতেন। তখন তিনি সবাইকে বলতেন যে, 'আল্লাহর ঘরে গিয়ে তোমার জন্য দোয়া করেছি'। এভাবে জনে জনে হজের তাগিদ ছোটবেলা থেকেই পেয়ে এসেছি। ডাক্তার হিসেবে আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ হয় ১৯৯২-৯৩ সালে এবং আকস্মিকভাবে আমার আম্মার মৃত্যুর পর ১৯৯৪ সালে উত্তরাধিকার সূত্রে আমার হাতে কিছু নগদ অর্থ আসে। সেই সময় হজের কথাটি আমি কিছুটা হলেও বিস্মৃত হয়ে যাই। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় বয়স্ক এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিরাই হজে যান। যার ফলে মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েশনের পরেই হাতে অর্থ আসার পরও সর্বপ্রথম হজযাত্রার বিষয়টি আমার মাথায় আসেনি, এজন্য এখনো মনোকষ্টের অন্ত নেই। আবার এটিও উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েশনই যথেষ্ট নয়, আরো কিছু পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন জরুরি হয়ে পড়ে। অতঃপর এমফিল ডিগ্রি অর্জন করতে আমার আরো কয়েকটি বছর লেগে যায়। ইতোমধ্যে আমি একক ব্যক্তি থেকে সংসার জীবনে প্রবেশ করি, সন্তান লাভ করি। কিছুটা অপ্রস্তুত এবং আকস্মিকভাবে একটি ফ্ল্যাট বাড়ির মালিক হতে গিয়ে আমার সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ি। যার ফলে হজের বিষয়টা আরও কিছুদিন পিছিয়ে পড়ে। ২০০৩ সালে আমি মালয়েশিয়ায় পিএইচডি গবেষণার লক্ষ্যে পাড়ি জমাই। একই প্রতিষ্ঠানে আমার স্ত্রী শারমিনও পিএইচডিতে ভর্তি হয়। মালয়েশিয়ায় আমার অসংখ্য অর্জনের মধ্যে এটিও ছিল যে, আমার এবং শারমিনের স্কলারশিপের অর্থ থেকে আমার ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। একদিকে আর্থিক ঋণমুক্তি, অন্যদিকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন। এসবের পর থেকেই হজের জন্য তাগিদ অনুভব করি। মালয়েশিয়া প্রবাসে খেয়াল করতাম যে, মালয়- ইন্দোনেশীয়রা যথাসম্ভব তরুণ বয়সে হজ চেতনা হৃদয়ে লালন করে। আমাদের প্রতিবেশী তরুণ হাজিদের দেখেও হজের চেতনা হৃদয়ে নাড়া দিত। সেখানে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে সন্তানের নামে 'তাবুং হাজী'তে (হজ ব্যাংক) একটি হজ সেভিংস স্কিম খুলে দেন। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের গ্র্যাজুয়েশন অর্জন করতে করতেই হজ করার মতো অর্থ তার হাতে জমা হয়। ছাত্র জীবনে হজের জন্য আর্থিক সঞ্চয়ের প্রবণতা থাকায় তারা মার্জিত, খোদাভীরু হয়। গ্র্যাজুয়েশনের পরই সুবিধাজনক সময়ে তারা হজ করে। সব মিলিয়ে প্রবাস জীবনে হজের জন্য বেশ প্রণোদনা পেয়েছি। ডিগ্রি অর্জনের পর বাংলাদেশে এসে থিতু হতে ২০০৮ গড়িয়ে গেল। সেই সময়ে হাতে

অবশ্য হজ করার মতো টাকা নেই। ইতোমধ্যে ২০১০ নাগাদ হাতে সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চয় হওয়ায় ২০১০ সালের শুরুর দিকে আমার এক নিকট আত্মীয়র সাথে আমার স্ত্রীর ওমরা পালন করার সুযোগ হলো, তার মক্কা মদিনা সফরের স্বপ্ন একটু সার্থক হলো। শারমিন ওমরা থেকে ফিরেই আমার হজের জন্য বুকিং দিয়ে রাখলেন। তখনও আমার হাতে হজ করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই। কিন্তু আল্লাহ হজের সুযোগ দিলে ঠেকায় কে? আল্লাহর অশেষ কৃপায় বুকিং দেবার কিছুদিনের মধ্যেই আমার নানার বাড়ির কিছু সম্পদ বিক্রয় হয় এবং নানার উত্তরাধিকার হিসেবে আমিও সেই সম্পদের কিছু নগদ অর্থ লাভ করি। যার মাধ্যমে সবচাইতে বনেদি ক্লাসে হজযাত্রার মতো অর্থ আমার কাছে এসে গেল। একটাই সমস্যা আমার মাতৃতুল্য শাশুড়ি অসুস্থ আর আমার সন্তানরা সবাই বয়সে ছোট। তাদের দেখভাল করা আমার স্ত্রীর জন্য খুব কঠিন। সেজন্য সংক্ষিপ্ত সময়ে হজ সফরের পরিকল্পনা করলাম। ট্রাভেল এজেন্টকে বললাম যে, আমাকে শেষ দিকের ফ্লাইটে পাঠিয়ে প্রথম দিকের ফ্লাইটে ফেরত আনতে হবে এভাবে। ফলে আমার অন্য সহযাত্রীরা যেখানে এক থেকে দেড় মাস হজযাত্রা করেছিলেন, সেখানে আমার মোটামুটি ১৫ দিনেই হজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

শুরু হলো প্রস্তুতি

হজের বুকিং দেয়ার কাজটি আমার জুলাই মাসে সম্পন্ন হয়েছিল। অতঃপর বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে এজেন্সির কাছে আমার পাসপোর্ট জমা দিলাম। আমার পাসপোর্টে বিভিন্ন দেশের সিল ছিল। পাসপোর্টটি স্মৃতিবিজড়িত বলা যায়। শেষ মুহূর্তে এজেন্সি আবার পাসপোর্টটি ফেরত পাঠালেন। সৌদি অ্যাম্বাসির যারা হজযাত্রীদের বিষয় দেখেন তারা আল্লাহর মেহমানদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে মজা পান। আমার পাসপোর্টের ছবির পাতা এবং পাশের পাতা কিঞ্চিৎ জোড়া লেগেছিল এই সামান্য অজুহাতে তারা সেটি ফেরত দিলো। মনে হলো মামুলি বিষয়কেও তারা কঠিন বানায়। ইবনে সিনা মেডিক্যাল চেকআপে থাকা অবস্থায় ১৯৯৩-৯৭ সালে সৌদিদের সাথে অনেক ঘনিষ্ঠতা ছিল। বর্তমানেও ইবনে সিনা মেডিক্যাল চেকআপের ইনচার্জ আমার সহকর্মী তাদের মাধ্যমে আমি আমার পাসপোর্টটি ওকে করার প্রস্তুতি নিলাম। কিন্তু এজেন্সিওয়ালারা আরেকটি পাসপোর্ট করাতে উৎসাহী। এই কাজে যাত্রীদের আর্থিক ক্ষতি, আর এজেন্সির লাভ। হজযাত্রীদের পুঁজি করে সুন্দর ব্যবসা। একটি পাসপোর্টের অধিকাংশ পাতা ফাঁকা থাকার পরও আবার পাসপোর্ট করা আমার কাছে ভালো লাগেনি। পরবর্তীতে সৌদি আরবে গিয়ে আমি দেখেছি অনেক হজযাত্রীকে এ কাজটি করতে হয়েছে। এ বিষয়ে সৌদি দূতাবাস হজযাত্রীদের বিষয়ে যথেষ্ট অনীহা অথবা উদাসীনতা অথবা তাদের অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ্যবোধ দেখায়।

যাই হোক, দেখতে দেখতে আমার যাত্রার সময় চলে এলো। আমার ইবনে সিনা মেডিক্যাল কলেজের সহকর্মী প্রফেসর শাকিলা আপা তার স্বামীসহ যাচ্ছেন। প্যাথলজি বিভাগের প্রধান ডা. রাফিজা এবং তার সেনা কর্মকর্তা স্বামী যাচ্ছেন। মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডা. আব্দুস সবুর এবং সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জাহাঙ্গীর ভুঁইয়া যাচ্ছেন প্রায়ই তাদের সাথে কথা হয়। এই অবসরে আমি বাংলাদেশে প্রাপ্ত হজের গাইডগুলো পড়ছিলাম। মিলিটারি ইনিস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজির শিক্ষক এবং আর্মি ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার তাজুল ইসলাম সাহেবের লেখা সংক্ষিপ্ত একটি হজ নির্দেশিকা আমাকে বিশেষ উপকার দিলো। ইবনে সিনার মিলন ভাই নয়াদিগন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হজ নির্দেশিকা আমাকে দিলেন এবং তাও আমাকে বেশ উপকার দিলো। ব্যক্তিগতভাবে ব্রিগেডিয়ার তাজুল সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেও আমি বেশ কিছু গাইডেন্স পেলাম।

ভবিষ্যতে যারাই হজে যাবেন তাদের উদ্দেশে আমার কথা হচ্ছে, হজের ফরজ এবং ওয়াজিব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো যাতে কোনো ভুল-ত্রুটি না হয়। মুয়াল্লিমদের খবরদারি আর বাহুল্য কাজ যা থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। আমি আগেই বলেছি যে, আমার হজ সফর হবে তুলনামূলকভাবে কম সময়ের। যার ফলে একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল সহকর্মী চলে গেলেন। আমার ঘনিষ্ঠ আল-মানার হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. শহিদুল্লাহ, তিনিও চলে গেলেন। এ সময় দেশে অবস্থান করে হজযাত্রী হিসেবে নিজের মধ্যে অন্যরকম বোধ করছি। আমার এখন অবস্থা এমন যে, মন গেছে আল্লাহর ঘরে অথচ আমি এখনও নিজ ঘরে পড়ে আছি। প্রতিদিন বাসায় টিভিতে হজ চ্যানেলে হজ দেখি এবং বাচ্চারাও দেখে এবং বলেন কখন তোমাকে দেখা যাবে। যাই হোক সর্বশেষে ২০১০ সালে নভেম্বরের ৭ তারিখ সকাল ৫.৪০ মি. গালফ এয়ারলাইন্সে ঢাকা থেকে বাহরাইন হয়ে জেদ্দা ফ্লাইটে টিকিট কনফার্মেশন হলো। আমার মুয়াল্লিম আসলাম সাহেব দলবল নিয়ে অনেক আগেই চলে গিয়েছেন, তার অফিস থেকে আমাকে জানানো হলো। যেহেতু আমার ফ্লাইট ভোর ৫.৪০ মিনিটে অর্থাৎ রাত ৩ টায় যেতে হবে। সেহেতু ৬ তারিখ রাত ১০ টায় আশকোনা হজ ক্যাম্পে যেতে হবে। তারা এটাও বললেন, হজ ক্যাম্পে এহরাম বাঁধার কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। যদিও পরবর্তীতে আমি বুঝতে পেরেছি যে, পূর্বের রাতে হজ ক্যাম্পে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সারারাত ক্যাম্পে নির্ঘুম থাকায় পরের দিন সকালে বিমান যাত্রা খুব কষ্টকর হয়েছে। এ বিষয়ে হজ এজেন্সির লোকজন সঠিক তথ্য আমাকে দিতে পারেননি। তারা আমাকে এই তথ্যও দিয়েছেন জেদ্দায় তাদের লোক আমাকে রিসিভ করবে। সেখানে আমি যে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিলাম তা একটু পরে বলব। হজ এজেন্সির নির্দেশনা অনুসারে রাত ১০ টায় আল-মানার হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বাসা থেকে বিদায় নিলাম। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যাওয়ার সময় বাসা থেকে বিদায় নিয়েছি। সেইসব

সফর ৩ দিন ৪ দিন বা এক সপ্তাহের সফর ছিল। এবারের সফর ১৫ দিনের হবে। এবার এক মহান উদ্দেশ্যে যাওয়া হচ্ছে, তাই এবারের বিদায়টা ভিন্ন রকম হলো। সর্বপ্রথম আমার শাশুড়ি আম্মার কাছে বিদায় নিলাম। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে আমার কাছ থেকে দোয়া নিলেন এবং আমাকেও দোয়া করলেন। তারপর সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমার স্ত্রী আমাকে সাবধানে থাকতে বললেন। সংক্ষিপ্ত লাগেজ নিয়ে আমি আল-মানার হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সে উঠলাম। আল-মানার হাসপাতালের গাড়ির ড্রাইভার আজহারুল্লাহ হাজী ক্যাম্পে রাত সাড়ে ১১ টায় পৌঁছে দিয়ে বললেন, আমরাও থাকি। আমি বললাম, 'রাত সাড়ে ১১ টায় বাজে তোমাদের থাকার দরকার নাই'। হাজী ক্যাম্পে পার্শ্ববর্তী এক কাফেলার একজন হাজী ভাইয়ের সহযোগিতায় আমি এহরাম বাঁধলাম। পরে বুঝেছিলাম, এহরাম পরে পরলে ভালো হতো। কারণ, সারারাত এহরাম বেঁধে বসে থাকা কষ্টকর। যেহেতু বিমানটি বাহরাইনে অপেক্ষা করছিল, বাহরাইন থেকে এহরাম বাঁধলেই যথেষ্ট হতো। যা আমি আমাদের সাথে যাওয়া অন্য দেশীয়দের করতে দেখেছি। হাজি ক্যাম্পে আর কিছু করার ছিল না। এহরাম বাঁধার পর আমি কিছু নফল নামাজ পড়লাম। সেখান থেকে বিমানবন্দরে যাওয়ার মাধ্যম বাস। বাসে করে রাত সাড়ে ১২ টায় বিমানবন্দরে গেলাম। যদিও ভোর ৫.৪০মি. ফ্লাইট। রাত ১টা বাজার আগেই বোর্ডিংয়ের কাজটি শুরু হলো। এই বিমানবন্দর দিয়ে অনেকবারই গিয়েছি। সেই দিন সবার আচরণ আমার কাছে ভালো লাগল। বিমানবন্দরের সিকিউরিটি হজযাত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করলেন এবং সবাই দোয়া চাচ্ছিলেন। আমাদের দেশে অনেক কিছু না থাকলেও এখনও অনেক ভালো কিছু অবশিষ্ট আছে ! রাত দেড়টায় বোর্ডিংয়ের পর বিমান-বন্দরে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। এই সময় আমার নিজস্ব কাফেলার কোনো ব্যক্তি এই ফ্লাইটে ছিলেন না, যার ফলে একা বোধ করছিলাম। আমার পাশের সিটের যাত্রীর সাথে পরিচিত হলাম। তিনি পেশায় একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। এ ছাড়া তিনি হজ ক্যাফেলাও পরিচালনা করেন। তার সাথে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করলাম। তিনি আমাকে জানালেন, বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবের সিম নিয়ে গেলে সুবিধা। তার কাছে একটি আছে তিনি আমাকে অফার করলেন। তা আমি টাকার বিনিময়ে নিলাম। পরবর্তীতে সৌদি আরবে গিয়ে দেখা গেল যে, সেটির ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেছে।

একটি বিষয় দুঃখজনক যে, বাংলাদেশের হজযাত্রীদের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং গ্রাম থেকে আগত। বিমানের টয়লেটে পানি খুব সীমিত, তাদের এ ধারণা নেই। বিমানবন্দরে বার বার সবাইকে বলা হয়েছে টয়লেটের কাজ সেরে নিতে। বিমানে ওঠার পরই যাত্রীরা একের পর এক টয়লেটে যাওয়া শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যে টয়লেটের পানিও শেষ হয়ে গেল। প্রতিটি টয়লেট থেকে দুর্গন্ধ আসতে শুরু করল যা কোনোভাবেই দূর হলো না। এমন অস্বস্তিকর ফ্লাইট আর কখনোই পাইনি। পুরো

ফ্লাইটজুড়েই টয়লেটের দুর্গন্ধ। দ্রুত পুরো উড়োজাহাজটি যেন এক বিষাক্ত গ্যাসচেম্বারে পরিণত হলো। অনেক হজযাত্রী হাজি ক্যাম্পে খাবার খাওয়ার কারণে তাদের টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছিল।

আমি এক সময় বরিশাল মেডিক্যালের ছাত্র ছিলাম। আমার কাছে মনে হতো নদীপথে ভ্রমণ সবচাইতে আরামদায়ক। বিমান যাত্রা তার থেকে একটু কষ্টকর। এবারের বিমান যাত্রাটা সবচাইতে কষ্টকর বোধ হলো। যাই হোক, স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় আমরা বাহরাইন বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। যেন এক মুক্তির অনুভূতি অনুভব করলাম। বিমান থেকে বাহরাইন শহর দেখে খুব ভালো লাগল। বাহরাইন এক সময় মৎস্য ব্যবসাতেই চলত। বর্তমানে আরো কিছু আয়ের উৎস রয়েছে। বাহরাইন সৌদি আরব থেকে সুন্দর দেশ এবং এদেশের রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা অনেকটাই সৌদি আরব থেকে ভালো। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক শিয়া তবুও বাদশা সুন্নি মতাবলম্বী। আমার দেখা অন্য বিমানবন্দর থেকে ছোট হলেও বেশ পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সেটি মুহূর্তের মধ্যে আমাদের হজযাত্রীদের ফেলা বিভিন্ন বিস্কুট আর চিপসের প্যাকেট নোংরা হয়ে গেল। বাহরাইন সময় ১১টায় আর একটি ফ্লাইটে উঠলাম। বিমানে ওঠার পর একই সাথে পুরো বিমান লাব্বাইক ধ্বনিতে মুখরিত হলো।

পুণ্যভূমিতে পদার্পণ

সৌদি জেদ্দা বিমানবন্দরে নামার আগেই সেই বিমানবন্দরের বিশালতা আমার নজর কাড়ে। আমার জানা মতে, এই বিমানবন্দরের ডিজাইনার প্রখ্যাত বাংলাদেশী স্থপতি ড. ফজলুর রহমান খান বা এফ আর খান। আকাশ থেকে দেখলে মনে হয় যেন মরুভূমির মাঝে অনেকগুলো তাঁবু ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। বিমানবন্দরে নামার পর প্রথম লাউঞ্জে দায়িত্বরত কর্মকর্তা আস্‌সালামু আলাইকুম হাজী, আস্‌সালামু আলাইকুম হাজী ইত্যাদি বলছিল। যদিও প্রচুর হজযাত্রীর ভিড় হবার কারণে বিমানবন্দরটি আমার দেখা সব বিমানবন্দরের চেয়ে এমনকি ঢাকা বিমানবন্দরের চেয়েও নোংড়া মনে হলো। ইমিগ্রেশন থেকে শুরু করে লাগেজ সেকশন পর্যন্ত লোকগুলো এমনকি বাসের টিকিট যারা ট্যাগ করেন তাদের সবার ব্যবহার খুবই খারাপ। তার চেয়েও বড় সমস্যার বিষয় বহুজাতিক হজ পরিচালনার জন্য যারা নিয়োজিত তারা আরবি ভাষা ছাড়া কথা বলতে পারে না। তারপর বাসের টিকিট ট্যাগ করার সিস্টেম খুবই জটিল। কার কখন ডাক আসবে কিছুই বোঝা যাচ্ছিলনা। বেশির ভাগ বাংলাদেশী হজযাত্রী অশিক্ষিত হওয়ার কারণে অযথাই একবার এদিক আর একবার ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছিল। অকারণেই ভিড় করে কাউন্টারের লোকদের মেজাজ আরো খারাপ করে দিচ্ছিলেন। বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনার বিপর্যয় আর বাংলাদেশী হজযাত্রীদের বিশৃঙ্খল ছোটাছুটি মন থেকে হজের পবিত্র অনুভূতি লোপ করে। সৌদি কর্তৃপক্ষের আর এক তুঘলকি কাজ হচ্ছে, সব বাসের টিকিটের

ষ্টিকার পাসপোর্টের ভিসার পাতায় লাগানো। পাসপোর্টে বাসের টিকিট লাগানো এটা কোন ধরনের ভদ্রতার মধ্যে পড়ে বুঝলাম না।

আমি আমার মুয়াল্লিমের সাথে মোবাইলে কথা বললাম। তিনি জানালেন যে, তিনি মদিনায় আছেন। আমাকে নিজের উদ্যোগে বাসে স্থান করে নিতে হবে। ৮০ নম্বর মুয়াল্লিমের যাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন আমি। এমন যে, একটি বাসে সর্বোচ্চ দু'জন মুয়াল্লিমের ৪০ জন যাত্রী উঠতে পারবেন। যেসব মুয়াল্লিমের একজন বা দু'জন যাত্রী আছে তাদের অনির্দিষ্ট সময় বসে থাকতে হবে। অর্থাৎ আমি একটার পর একটা বাস দেখছি, একজন বা দু'জন মুয়াল্লিমের যাত্রীতে বাস ভরে যাচ্ছে। বাসের পর বাস যাচ্ছে কিন্তু আমার স্থান হচ্ছে না। এখানে কর্মরত বাংলাদেশী মিশনের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মহিউদ্দিন সাহেবকে বিষয়টি বললাম। তিনি বললেন, এ বিষয়ে তাদের করার কিছুই নেই। তার অভিজ্ঞতা থেকে জানালেন যে, শুধু বাসের অপেক্ষায় জেদ্দা বিমানবন্দরে একদিন বা দু'দিন বসে থাকতে হতে পারে। এমন হয়রানি আমার জানা ব্যবস্থাপনার মধ্যে পড়ে না। গত রাতেও আমার ঘুম হয়নি। বিমানেও বিশ্রামের কোনো সুযোগ পাইনি। আর একটার পর একটা বাস ছোটাছুটি করতে করতে আমি কাতর হয়ে পড়েছি। বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত মেডিক্যাল অফিসার চেনাচেনা লাগে। তিনি আমাদের বরিশাল মেডিক্যালের দশম ব্যাচের ইউসুফ ভাই। আমাদের ইন্টার্নির সময় তিনি সেখানে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি জাতীয় হৃদরোগ ইনিস্টিটিউটে কর্মরত আছেন। আমাকে দেখে আলিঙ্গন করলেন। তিনি অনেক ছোটাছুটি করলেন। কিন্তু অব্যবস্থাপনার মাঝে তার কিছুই করার থাকল না। এভাবে বেলা দেড়টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত কাউন্টারে ছোটাছুটি করতে করতে আমার প্রায় জ্ঞান লোপ পাবার দশা! আমার দুর্দশা কোনো একজন বাস ড্রাইভারের নজরে এলো। পাকিস্তানি একটি হজযাত্রীবাহী বাসের চল্লিশতম যাত্রী হিসেবে ঐ বাসে ওঠার আমার সুযোগ হয়। বাসটি মক্কা যাওয়ার পথে চেক করা হয়। আল্লাহর মেহমানের বাস থামিয়ে এত বেশি চেক করাতে আমার বিরক্তি আরো একটু বাড়ল। আমি যখন ক্লান্তিতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছি তখন অচেনা জায়গায় বাস থামিয়ে আমার সাথে আলোচনা না করেই ড্রাইভার বাস থেকে আমাকে নামিয়ে দিলো। কিছু সময়ের জন্য অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলাম। বাস ড্রাইভার কিছুতেই আমাকে ব্যাপারটা বোঝাতে পারছিলেন না তিনি কোথায় আমাকে নামাচ্ছেন। যাই হোক, রাস্তায় বসে থাকতে থাকতে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাইতে লাগলাম। সেখানে একজন বাংলাভাষী মুয়াল্লিম কর্মী পেলাম। তিনি জানালেন, আসলেই এটি ৮০ নম্বর মুয়াল্লিমের তাঁবু। সেখানে তারা আমাকে একটি প্যাকেট ধরিয়ে দিলো। তাতে নিম্নমানের একটি কেক, একটি বনরুটি ও একটি নিম্নমানের চিপস ছিল। এত দুর্ভোগ সত্ত্বেও মুয়াল্লিম কর্মীর মুখে বাংলা ভাষা শুনতে পেয়ে আমি নিশ্চিত হলাম যে, জায়গামতো পৌঁছেছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমি হেরেম শরিফ দর্শন করব। এই

অনুভূতি আমাকে আবার আবেগে আপ্লুত করল। এসব বাধা আল্লাহর ঘর পরিদর্শনে না থাকলে মনে হত এত সহজে তা পেয়ে গেছি! ভোর রাতে মুয়াল্লিম অফিস থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী রোহিঙ্গা যার নাম ওয়াজেদ সে আমাকে আল্লাহর ঘর সংলগ্ন দার আল সাউদ হোটেলের লবিতে রেখে গেলেন। এটি কিং আবদুল আজিজ গেটের বিপরীতে লা মেরিডিয়ান হোটেলের ঠিক পাশে থ্রি-স্টার মর্যাদার একটি হোটেল। এখানে হোটেলে কর্মরত খোরশেদ ও মোরশেদ দুই ভাই বাংলাভাষী যাদের বাড়ি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। তারা আমার জন্য সকালের খাবার আনতে চাইলে আমি বললাম, আমাকে তাড়াতাড়ি বিশ্রামের সুযোগ দেয়া হোক। আমি তাড়াতাড়ি ওমরা শেষ করতে চাই। তাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় বুঝলাম মুয়াল্লিম-এর পক্ষ থেকে আমাকে এই হোটেলে কোথায় রাখবে এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা নেই। বিষয়টি আমাকে আবারও বিস্মিত অনুভূতির দিকে নিয়ে গেল। মুয়াল্লিম তার দলবল নিয়ে মদিনায় অবস্থান করছে। তার দলের কেউ কেউ এই হোটেলে অবস্থান করছেন। আমি ওমরার আগে ওদের আর কোনো আপ্যায়ন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালাম। আর বাস্তবে আমার তখন মাইগ্রেন শুরু হয়ে গেছে। বনরুটি বা বার্গার এ জাতীয় খাবার একদম মুখে নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। নিছক ডাল-ভাত খেতে পারলেও হতো। সকাল ৮ টা বা সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করলাম। এ অবস্থায় খোরশেদ-মোর্শেদ ভাইদ্বয় আমার প্রতি মায়া অনুভব করলেন। তারা জানাল, এই হোটেলের ছাদে তাদের মাটিতে পাতা বিছানায় তারা আমাকে বিশ্রামের সুযোগ দিতে পারে। যদি আমি রাজি হই।

আমি নির্দ্বিধায় রাজি হলাম। অন্ততপক্ষে এই ছেলে দুটোর আন্তরিকতাকে খাটো করতে আমার মন চাচ্ছিল না। আমি হোটেলের ছাদে স্টাফদের থাকার স্টোর জাতীয় রুমে অবস্থান করতে থাকলাম। মুয়াল্লিমকে যতবারই ফোন করছি তার ফোন নো রেসপন্সই থাকছে। পরবর্তীতে আমি জানলাম, এই হোটেলটি বছরের অন্যান্য সময় থ্রিস্টার হোটেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, হজের সময় কক্ষটিজুড়ে হজযাত্রীদের রাখা হয়। একজনের কক্ষে চারজন রাখা হয়। আমার জন্য একটি বড় কক্ষে যেখানে ৪টি বিছানা পাতা আছে সেখানে ঢাকার কোনো এক গার্মেন্টস-এর প্রডাকশন ম্যানেজার জাতীয় তিনজন ব্যক্তি থাকেন। তাদের রুমে আরো দুটো বা একটি খাট পাতা আছে।

তাদের বলা হয়েছে সেখানে চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে আমাকে নিতে হবে। ইতোমধ্যে রুমটি ওভার বার্ডেন্ড। কাজেই, তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে অতিরিক্ত খাটটি খুলে লবিতে রেখে গেছে। এই খবরটি আমি খোরশেদ-মোর্শেদের আলাপচারিতায় বুঝলাম। মুয়াল্লিম আমার ফোন রিসিভ না করলেও বেলা ৩টার দিকে তার একজন আত্মীয় কাসেম সাহেব যিনি দীর্ঘদিন সৌদি আরবে মক্কায় কর্মরত। তিনি হজের মাসলা-মাসায়েল খুব ভালোভাবে জানেন। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসলেন

এবং আমার দুরবস্থা দেখে তিনি সমবেদনা প্রকাশ করলেন। আমার জন্য খাবার আনতে চাইলেন। আমি দৃঢ়ভাবে বললাম যে, সর্বাগ্রে আমি ওমরা করতে চাই। কাসেম সাহেব আন্তরিকভাবেই বললেন যে, কিঞ্চিত খাবার না খেয়ে ওমরাহ করা আপনার জন্য বিপজ্জনক হবে। কাসেম সাহেব মিসফালা থেকে ডাল, ভাত, পালং শাক এবং মুরগির গোশত নিয়ে আসলেন। সে খাবার খেয়ে তার সাথে ওমরাহ করতে গেলাম। কাশেম সাহেবের এই আন্তরিকতা সম্ভবত আমার হাশরের ময়দান পর্যন্ত মনে থাকবে। দার আল-সৌদ থেকে আল্লাহ্‌র ঘর এক-দেড়-শ মিটারের মধ্যে মানুষের ভিড় পাড়ি দিয়ে আব্দুল আজিজ গেট দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলাম।

প্রথম ওমরা

খানিকটা পথ গিয়ে যখন কালো গিলাফে আবৃত আল্লাহর ঘর আমার নজরে এলো তখন আমার যাবতীয় ক্লান্তি এবং অভিমান মুহূর্তের মধ্যে চলে গেল। আমাকে বলিয়ান হতে দেখে কাসেম সাহেব সবুজ বাতির কাছে নিজের অবস্থান নিয়ে আমাকে সাতবার তাওয়াফ করে তাকে ধরতে বললেন। কারণ, এমন ভরা রোদে তার মতো বয়স্ক মানুষের পক্ষে পুরো তাওয়াফে আমার সাথে থাকা কষ্টকর। আমিও নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে গেলাম। এই সময়টি সূর্যের তাপ সবচেয়ে বেশি থাকলেও একটু সুবিধা হলো, এই সময় লোকের উপস্থিতি কম, কাজেই সাতবার তাওয়াফ আমি অত্যন্ত দরদ ও আবেগ দিয়ে ভালোভাবে করতে পারলাম। মাঝে মাঝে তাওয়াফের শুরুর স্থানের কিনারায় সবুজ বাতির নিচে অবস্থানরত কাসেম সাহেবের দিকেও খেয়াল রাখছিলাম। তাওয়াফ যখন শেষ হলো, সবুজ বাতির কাছ থেকে কাসেম সাহেব আমাকে শনাক্ত করতে পারলেন।

সাফা-মারওয়ায় ঢোকার আগে ইচ্ছেমতো জমজমের পানি পান করলাম। দার আল-সৌদ হোটেলে তাদের কাছে সংরক্ষিত জমজমের পানি থেকে আগেই খেয়েছি। কিন্তু জীবনের প্রথম সাত তাওয়াফের পর কত গ্লাস পানি খেয়েছি তা আমি মনে করতে পারছি না। তা আমার কাছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয় বলে মনে হলো। যতই খাচ্ছিলাম ততই আমার শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছিল এবং সমস্ত ক্লান্তি বিদূরিত হচ্ছিল। কী এক বেহেশতি তাড়নায় আমি শক্তিপ্রাপ্ত হলাম! কাসেম সাহেব আমাকে সাফা পাহাড়ে নিয়ে আমাকে সায়ী করার নির্দেশনা দিলেন এবং তিনি সেখানেই অবস্থান করলেন। সায়ীর মাঝে মাঝে আমি আবার জমজমের পানি খেলাম। আগেই বলেছি যে, এই পথটি বিবি হাজেরার অনুসৃত পথ, এখানে একটা নির্দিষ্ট পথে পুরুষদের জোরে জোরে হাঁটতে হয়। সায়ী সম্পূর্ণ করার পর কাসেম সাহেব আমাকে আবারো আব্দুল আজিজ গেট দিয়ে হোটেল আল-সৌদের দরজায় রেখে গেলেন। মসজিদুল হারামে অসংখ্য গেট এবং পথ হারাবার প্রচুর সম্ভাবনা তিনি নিজে আমাকে হোটেলে রেখে না গেলে সেটা খুঁজে বের করা আমার পক্ষে কঠিন হতো।